উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শুক্রবার ২৬ আশ্বিন ১৪২৪ ■ ৩৮ বর্ষ ■ ১৪৩ সংখ্যা

ঐতিহাসিক রায়

নাবালিকা স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসকে ধর্ষণ বলে গণ্য করা হবে বলে রায় দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। যা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিকও। যে কোনো নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে সহবাসকে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে ধর্ষণের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আগে এই সংজ্ঞা কার্যকর হত না। সম্প্রতি সেই বিষয়টি নিয়েও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এবার সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়েছে নাবালিকা স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস ধর্ষণ হিসাবে গণ্য হবে। এই রায়ের ফলে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাল্যবিবাহের ঘটনা ফের প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। বস্তুত পাশ্চাত্যের আলোকপ্রাপ্ত কয়েকটি দেশ ছাড়া সারা বিশ্বেরই নারীদের অবমাননা এখনও অব্যাহত। পুরুষ শাসিত দেশও সমাজে বহু লাঞ্ছনা, নিপীড়ন তাঁদের সহ্য করতে হয়। যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারীরা স্বাভাবিক বা 'নিজের ভাগ্য' বলে মেনে নেন। প্রতিবাদ করলেই সমস্যা। ফলে যতই 'অর্ধেক আকাশ' বলে কাব্যে নারীকে মর্যাদা দেওয়া হোক, বাস্তব পরিস্থিতি সিংহভাগ ক্ষেত্রেই এর বিপরীত। এই রাজ্য ও দেশেও বহু ক্ষেত্রে নারী অবমাননা, লাঞ্ছনা, নিপীড়ন অবিরত হয়ে চলেছে। শুধু স্বামী ও শ্বশুরবাড়িতে নয়, নিজের পরিবারেও যে সবসময় কন্যাটি প্রাপ্য ভালোবাসা, মর্যাদা পায় তা নয়, তাই যদি হত তবে এখনও কন্যাকে দায় বলে মনে করা হত না। পিতারা নিজেদের কন্যাদায়গ্রস্ত ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন না। শুধু আর্থিকভাবে দুর্বল পিতামাতা নয়, উচ্চশিক্ষিত, ধনবান বহু পরিবারেও এই মনোভাব অব্যাহত। কন্যাসন্তান জন্মানোমাত্র কীভাবে, কত দ্রুত তাকে পাত্রস্থ করা যায়, সেই চিন্তাতেই থাকেন তাঁরা। যার ফল, এখনও এই দেশে আইন থাকা সত্ত্বেও বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। আইনত কন্যার বয়স ১৮ ও পুত্রের বয়স ২১ না হলে তাদের বিবাহ দেওয়া যায় না। কিন্তু এই আইনকে কার্যত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কন্যাদের বাল্যবিবাহ এখনও অব্যাহত। ১৯৯৮ সালে রাষ্ট্রসংঘের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, ভারতে ৪৭ শতাংশ বাল্যবিবাহ হয়। যদিও ২০০৫ সালে তা ৩০ শতাংশে নেমেছে বলে রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট। দেশে প্রতি দশ বছর অন্তত যে জনগণনা হয়, সেখানেও সরকারের দাবি, বাল্যবিবাহের সংখ্যা অনেক কমেছে। ২০০৯ সালে এই সংখ্যা ৭ শতাংশ বলে সরকারি সূত্রে জানা যায়। বিশেষত শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে এর হার তিনগুণ বেশি। এই ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি এগিয়ে আছে ঝাড়খণ্ড, ১৪.১ শতাংশ বাল্যবিবাহ ওখানে হয়। ১৯২৯ সালে স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতেই শিশুবিবাহ বেআইনি বলে ঘোষিত হয়েছিল। ব্রিটিশ আমলে কন্যা ও পুত্রদের ক্ষেত্রে বিয়ের বয়স যথাক্রমে ১৫ ও ১৮ বছর করা হয়। ১৯৭৮ সালে তা সংশোধন করে বর্তমানের ন্যূনতম বিয়ের বয়স ঠিক করা হয়েছে। যদিও বহু ক্ষেত্রে তা লঙ্ঘিত হওয়ার ঘটনা কম নয়। সর্বোচ্চ আদালতের সাম্প্রতিক রায়কে প্রগতিশীল মহল স্বাগত জানালেও সকলেই যে এতে খুশি বলা যায় না। শুধু পরিবার আয়োজিত সামাজিক বিয়ে নয়, বহু ছেলে-মেয়ে সাবালক হওয়ার আগে নিজেদের পছন্দমতো বিয়ে করে। যার সিংহভাগই হয় পরিবারের অমতে, গোপনে এবং যা নথিভুক্ত করা সম্ভব হয় না। এইক্ষেত্রেও নাবালিকাটির ভবিষ্যৎ বহু ক্ষেত্রে সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। যতদিন যাচ্ছে স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য সম্পর্ক যেন জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। বিশেষত কন্যা যদি নাবালক হয়, সে যদি নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করে, তা যে বৈধ হবে না, আইনে তা স্পষ্ট। নাবালক স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস ধর্ষণ হিসাবে গণ্য করা হলেও আদতে তা কতজন মানবেন তা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। যে দেশে সিংহভাগ মানুষ এখনও কন্যাকে রত্ন না ভেবে দায় বলে ভাবেন, তাঁদের শিক্ষিত করার প্রয়াস নেন না, সেখানে এই রায় কার্যকর করা মুশকিল। তবে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। এই রাজ্যে কন্যাশ্রী রূপায়িত হওয়ায় নাবালক কন্যাবিবাহ বহু ক্ষেত্রে রোধ করা সম্ভব হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সহ একাধিক রাজ্যে কন্যাদের শিক্ষাদান নিয়ে যেসব প্রকল্প চালু আছে, তার যথাযথ রূপায়ণ করা জরুরি, প্রয়োজনে নাবালিকা বিবাহ রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। একমাত্র যথার্থ আলোকিত মনই এইসব কুপ্রথার বিরুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। এরজন্য চাই প্রকৃত শিক্ষা।

অমৃতধারা

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা নিয়ে তাই দিয়ে তাকে বিচার করবার, এমনকি আগে থেকে তাকে দেখার চেষ্টা করলে ভুল হবে। কারণ সে-ধারণা হল বর্তমানের, আর যে পরিমাণেই তা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হোক না, তা হবে পার্থিব সমস্যার যাবতীয় অঙ্গের মধ্যে, ভবিষ্যতের নয়, বর্তমানের সম্বন্ধাবলির প্রতিলিপি। বর্তমানের ব্যবস্থা থেকে ভবিষ্যতের ব্যবস্থা অনুমান করা হল বিতর্করূপ মানসবৃত্তির খেলা—যদিও এ অনুমান কখন-বা অবচেতনারও মধ্যে চলতে পারে এবং আধারের মধ্যে অপরোক্ষ-অনুভূতি বলে দেখা দিতে পারে। বিতর্ক হল মানুষী বৃত্তি অর্থাৎ ব্যক্তিগত, বিতর্কগত অনুপ্রেরণা অনন্ত হতে ; অসীম হতে, ভগবান হতে আসে না। কেবল সর্বজ্ঞানের মধ্যে, কেবল যখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানশক্তি এক হয়ে গিয়েছে তখনই ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমানের যাবতীয় সম্বন্ধাবলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া সম্ভব, কিন্তু সে অবস্থায় ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান বলে কিছু থাকে না, সবই নিত্য বর্তমান। আর এইসব সম্বন্ধাবলির প্রকাশ-ক্রম কেবল পরাৎপরের প্রেরণার উপর ভাগবত বিধানের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে আবার এই বিধানের বিরুদ্ধে বাহ্যতম জগৎ কতখানি বাধা দেয় তার উপরেও। এই দুয়ের সংমিশ্রণে হয় প্রকাশের লীলা। আর আমার বর্তমানের চেতনায় যতখানি জানা সম্ভব তা থেকে দেখি, সে -সংমিশ্রণ হল একটা অনির্দিষ্ট বস্তু। ঠিক এই খানেই তো লীলা, তার অভূতপূর্বতা।..

—শ্রীমা

শব্দরঙ্গ ■ ১৮১৭

পাশাপাশি : ১। চালক যন্ত্র যা দিয়ে রেল ও মোটরগাড়ি চলে ৩। থাকার জায়গা বা বাসস্থান ৫। চটের বড়ো থলে ৬। প্রাণে মারা বা খুন করা ৮। স্বামী ও ননদের দিদি ১০। দুর্ঘটনায় জখম ১২। প্রশ্নের উত্তর ১৪। বন্যপ্রাণী খাটাশ ১৫। পাইপ অথবা পৌরাণিক চরিত্র ১৬। বাতিল করে দেওয়া।

উপর-নীচ : ১। আদমি বা মানুষ ২। অলংকার শাস্ত্রের নয়টি ভাব ৪। সমুদ্রে চলার উপযুক্ত নৌকা ৭। শিবের অনুচর ৯। ধানের খই ১০। অন্যমনস্ক ১১। তেমন কিছু নেই অর্থাৎ বিদ্যাও নেই বুদ্ধির একই অবস্থা ১৩। যে ঘরে গেলে লাঙল তুলে ধরতে হয়।

সমাধান ■ ১৮১৬

পাশাপাশি : ১। বরগা ৩। রগরগে ৪। জনক ৫। মালপোয়া ৭। কাপ ১০। কচি ১২। ঝালাপালা ১৪। পথিক ১৫। দশানন ১৬। তমসা।

উপর-নীচ : ১। বকাঝকা ২। গাজর ৩। রকমারি ৬। পোশাক ৮। পয়লা ৯। আলাপন ১১। চিকিৎসা ১৩। তাকত।

শান্তির নোবেল শান্তির উদ্দেশ্যে যেন এক সোচ্চার বার্তা

শান্তির নোবেল ঘোষিত হয়েছে। এ বছর পরিস্থিতি একটু অন্যরকম। পুরস্কারটাও। লিখেছেন **অতনু বিশ্বাস**।

নিয়ম করে আর একটা শান্তির নোবেল ঘোষণা হল। যেমনটা প্রতিবছর হয়। তবে এ বছরের পরিস্থিতিটা বোধহয় একটু অন্য রকমের। পুরস্কারটাও। ইনটারন্যাশনাল ক্যাম্পেন টু অ্যাবোলিশ নিউক্লিয়ার উইপনস্ (আইসিএএন) সংস্থাটি পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। আজ যখন উত্তর কোরিয়া নিয়ে ভয়ে অস্থির গোটা বিশ্ব, সেই প্রেক্ষিতে আইসিএএনকে এই নোবেল পুরস্কার দেওয়া যেন শান্তির উদ্দেশ্যে এক সোচ্চার বার্তা দেওয়ার চেষ্টাই। অন্তত তেমনটাই দেখার চেষ্টা করেছে অনেকে। জেনিভাভিত্তিক এই সংস্থাটির প্রচেষ্টাতেই কিন্তু রাষ্ট্রসংঘে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে চলেছে। পারমাণবিক অস্ত্র বিনাশে এবং তার ব্যবহার নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে। রাষ্ট্রসংঘের ১৯২টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এই আলোচনা করেছে, তৈরি করেছে ১০ পৃষ্ঠার এক চুক্তিপত্র। তবু আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্সের মতো শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি কিন্তু এই চুক্তির বিরুদ্ধে। পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহারকে আইন এবং অনুশাসনের বেড়াজালে বাঁধতে চায় এই চুক্তি। ওদিকে বেশি শক্তিধর দেশগুলি এই চুক্তিকে বলেছে লক্ষ্যহীন। তাদের যুক্তি—সত্যি সত্যি কেউ কি মনে করে যে উত্তর কোরিয়ার কিম এই ধরনের কোনো অস্ত্র সংবরণের চুক্তি মেনে নেবেন? এক যৌথ বিবৃতি দিয়ে আমেরিকা, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স জানিয়েছে, 'আমরা এতে স্বাক্ষর করতে, অণু-পরিবর্তন করতে, কিংবা কখনই এর অংশ হতে চাই না।'

আইসিএএন কিন্তু এই পুরস্কারটিকে বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ প্রচারক ও নাগরিকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধায় উৎসর্গ করেছে। যারা পরমাণু অস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে তাদের উদ্দেশ্যে। যারা রাষ্ট্রসংঘের চুক্তির সমর্থনে সেইসব দেশের উদ্দেশ্য আর প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে শুভ। তাকে শ্রদ্ধা জানিয়েও ভেবে দেখি যে, এই বেশি শক্তিধর দেশগুলির যুক্তি কিন্তু অগ্রাহ্য করার মতো নয়।

আইসিএএন যে কাজটা করছে বা করেছে, অর্থাৎ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চ্যাঁচামেচি করা, তা তো আমাদের ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছি। হিরোশিমা দিবসে পাড়ায় পাড়ায়, স্কুলে স্কুলে ভাষণ দিয়েছেন কতজন। সেসব আওয়াজ আসলে সেই গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকে। যারা একটু বড়োমাপের ব্যক্তি কিংবা সংস্থা, তাদের চ্যাঁচামেচিটা মাইকের আওয়াজের মতো জোরে শোনা যায়, চারধারে ছড়িয়ে পড়ে, এই যা। সংস্থাটা আরও বড়ো হলে, শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘে চুক্তিও হয়তো হয়। এমন একখানা চুক্তিতে আমেরিকা স্বাক্ষর না করলেও, হল্যান্ড বিরুদ্ধে ভোট দিলেও, ব্রিটেন কিংবা ফ্রান্সের মতো প্রবল শক্তি আগ্রহ না দেখালেও, এই চুক্তি নিয়ে হইচই হয়। শেষে উদ্যোক্তা সংস্থাটিকে অসলোতে ডেকে নিয়ে নোবেলটাও দিয়ে দেওয়া হয়। ওদিকে, আমার পাড়ার ক্লাব, ওপাড়ার বিজ্ঞান মঞ্চ—সর্বত্রই এমন ধারা পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে কিন্তু প্রতিবাদ চলছেই। কিন্তু এই আওয়াজ জোরে হলেই যে বিশ্বে নির্ভেজাল শান্তি বিরাজ করবে তেমনটা তো আর নয়। অনেকেই মনে করেন যে, শক্তিহীন জাতিগুলির মুখে নিরস্ত্রীকরণের কথা কোনো কাজের নয়। মোদ্দা কথা শক্তিধররা তাদের কথা এক কান দিয়ে শুনবে, আর...। তা বলে দুই শক্তির আস্ফালনেও যে শান্তি পুরোদস্তুর বিরাজ করবে তেমনটাও যে নয়। মহাভারতের শান্তি পর্বটা তো এসেছিল কুরু-পাণ্ডব এই দুই মহাশক্তির সামরিক সংঘাতের পরেই। আজকের দিনেও দুই শক্তির দাপাদাপিতে শান্তিও যে নতুন করে সংজ্ঞায়িত হতে চলেছে। এককালে সাবেক আমেরিকা আর সোভিয়েতের দ্বন্দ্বের ঠান্ডা স্রোতের মধ্যেই সিঁটিয়ে থেকেছে বিশ্ব। আর আজ প্রশান্ত মহাসাগরের একধারে ডোনাল্ড ট্রাম্প আর অন্যদিকে কোরিয়ান উপদ্বীপের উত্তরে বসে কিম জং উন দিয়ে চলেছেন হুংকার আর প্রতি হুংকার। এমন একটা পরিস্থিতিতে বিশ্বশান্তি যে এক্কেবারে রিডিফাইন্ড!

পারমাণবিক অস্ত্রের এই ঝনঝনানির মধ্যে নরওয়ের নোবেল কমিটি আইসিএএনকে নোবেল শান্তি দিয়ে হয়তো কিঞ্চিৎ বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কাকে? আমেরিকা যে আইসিএএন-এর শান্তি প্রচেষ্টাকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছে না সেটা তো স্পষ্ট। আর কিম জং-উন কি নোবেল কমিটির বার্তাতে খুব অনুপ্রাণিত হবেন বলে মনে হয়? উত্তর কোরিয়ার একনায়ক এই ছোকরা কিমকে ডোনাল্ড ট্রাম্প আদর করে নাম দিয়েছেন 'রকেট ম্যান'। সে নাকি রকেট ছুড়তে ভীষণ ভালোবাসেন। এই তো সেদিন জাপানের উপর দিয়ে দুটো রকেট উড়িয়ে দিলেন। মাঝে মাঝেই বাজি পোড়ানোর মতো করে এক একটা পারমাণবিক পরীক্ষা করে চলেছেন। এখন আবার নাকি হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষার তাল করছেন। দেওয়ালিতে একবার ভারত ঘুরে গেলে কিম হয়তো বাজি-টাজি দেখে বড়োই আমোদ পেতেন। কিন্তু কিমের এই বাজি পোড়ানোতে বাকি পৃথিবী যে জুজুর ভয় দেখছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পর্যন্ত খানিকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখাচ্ছে। আসলে এই পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র বোধকরি বড়োদের খেলনা। বড়োদের খেলনা বাচ্চাদের হাতে দেওয়াতে এই কারণেই বোধহয় বিধিসম্মত সতর্কীকরণ দেওয়া থাকে। তাতে যে কেবল বাচ্চাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে তা নয়, বড়োদের নিরাপত্তারও যে দফারফা। এই সমস্ত বড়োর খেলনাগুলি তাই বুঝদার বড়োদের হাতে থাকাটাই মঙ্গলের।

> ছোকরা কিম আর বারবার হুংকার দিতে থাকা ট্রাম্পকে একসঙ্গে শান্তির নোবেল দিলেই বোধকরি ভালো হত। একটা দুর্দান্ত চমকও হত। কোরিয়ান উপদ্বীপ থেকে মহাশ্মশানের গন্ধমাখা বাজি পোড়ানোর উৎসব তাতে কমত কিনা অবশ্য বলা কঠিন।

কিম কিন্তু দেখা যাচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের চোখরাঙানিতে ভয় পাচ্ছেন না। জাপান সমুদ্রের ওধারে বসে শিনজো অ্যাবে কিঞ্চিৎ বকে দিলেও কিম তাতে পাত্তা দিচ্ছেন না একেবারে। বেজিং থেকে শি জিনপিং কিছু বললেও কিম বোধকরি অবিচল থাকার প্রতিজ্ঞা করেছেন। এই অবস্থায় আইসিএএনকে শান্তির নোবেল দিয়ে নোবেল কমিটি কিমকে কী বোঝাতে পারবেন তা নিয়ে শক্তিধর দেশগুলির যে ঘোরতর সন্দেহ আছে তা তো একেবারে স্পষ্ট !

২০০৯ সালে বারাক ওবামার নোবেল শান্তি পুরস্কারটার দিকে একবার ফিরে তাকানো যাক। ওবামা হোয়াইট হাউসের বাসিন্দা হওয়ার মাত্র ১২ দিন পরে হয় নোবেলের জন্য তাঁর নমিনেশন। আর তার পরে সে বছর নোবেল পান ওবামা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছিল যে, ওই ১২ দিনে ওবামা এমন কী করলেন যার জন্য তাঁকে নোবেলটা দেওয়া হল। নোবেল কমিটি অবশ্য সরকারিভাবে কারণ বলেছে, 'আন্তর্জাতিক কূটনীতি এবং জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে অসাধারণ প্রচেষ্টার জন্য' নাকি শান্তির নোবেলটা দেওয়া হয়েছিল ওবামাকে। নিউ ইয়র্ক টাইমস কিন্তু বড্ড চাঁচাছোলা ভাষায় চমৎকারভাবে ওবামার নোবেলকে বর্ণনা করেছে। তারা একে বলেছে এক অত্যাশ্চর্য বিস্ময়! এমন কথাও শুনেছি যে, ওবামা হয়তো নোবেল পেয়েছিলেন বুশ জমানা থেকে আমেরিকাকে বা পৃথিবীকে মুক্তি দিয়েছিলেন বলে। কিংবা হয়তো বা ভবিষ্যতে এক সুস্থির শান্তিময় পৃথিবী যাতে পাওয়া যায় সে জন্য তাঁকে একটা শান্তির নোবেল দিয়ে রাখা, যাতে কোনো অশান্তির কাজের ক্ষেত্রে ওই শান্তির নোবেলটা কাঁটা হয়ে দেখা দেয়।

এটা যদি সত্যিই হয়ে থাকে, তা কিন্তু একটা চমৎকার আইডিয়া! আচ্ছা, তাহলে কিম জং-উন আর ডোনাল্ড ট্রাম্পকে একসঙ্গে শান্তির নোবেল দিলে কেমন হত? মনে থাকতে পারে, ১৯৯৪ সালে ইয়াসার আরাফত, সাইমন পেরেজ আর ইয়াৎজিক রবিনকে একসঙ্গে শান্তির নোবেল দেওয়ার গল্প। এই পরিস্থিতিটা ঠিক সেরকম নয় হয়তো। তবু, ইতিহাস থেকেই তো আমাদের শিক্ষা। তাই ছোকরা কিম আর বারবার হুংকার দিতে থাকা ট্রাম্পকে একসঙ্গে শান্তির নোবেল দিলেই বোধকরি ভালো হত। একটা দুর্দান্ত চমকও হত। কোরিয়ান উপদ্বীপ থেকে মহাশ্মশানের গন্ধমাখা বাজি পোড়ানোর উৎসব তাতে কমত কিনা বলা কঠিন।

মহাভারতের যুগে যদি নোবেল পুরস্কারের রেওয়াজ থাকত, তবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে আগে শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যর চেয়ে যুধিষ্ঠির আর দুর্যোধনকে যৌথভাবে শান্তির নোবেল দেওয়াটা কি যুদ্ধ আটকাতে বেশি ফলদায়ক হতে পারত? তবু, একটা চেষ্টা তো অন্তত করা যেত, এই আর কি!

লেখক ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউট, কলকাতার রাশিবিজ্ঞানের অধ্যাপক।

জনমত

এখন থেকে যানবাহনের কুশপুতুল পোড়ানো হোক

বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং দাবি আদায়ের জন্যে যতরকম পথ অবলম্বন করা হয়ে থাকে, তার মধ্যে অনশনকে যদি শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসানো যায়, তবে ট্রেন-বাস-ট্রাম ট্রাক সহ অন্যান্য যান পোড়ানোকে জঘন্যতম অপরাধ বলেই গণ্য করতে হয়। 'অনশন' ব্যাপারটির ধার এখন অবশ্য অনেকটাই কমে গেছে। খেয়েদেয়ে পান চিবোতে চিবোতে রিলে প্রথায় 'অনশন' করার রেওয়াজই বর্তমানে চলছে। মানবিক কারণে 'ঘেরাও'-কে যেমন সমর্থন করা যায় না, তেমনি 'ধরনা','অবরোধ'-কে মানা উচিত নয়। সেদিক থেকে 'কুশপুত্তলিকা দাহ' সমর্থনযোগ্য। এতে যেমন উত্তাপ আছে, আছে ধ্বংস করার পৈশাচিক উল্লাস, তেমনি শালীনতা বজায় রাখলে প্রতিবাদের ভাষাও হয় জোরালো।

দেশের মুখ্যমন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী তো সারা দেশে পুড়ে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছেন। অন্য মন্ত্রীরাও বাদ যান না, বাদ যান না ছোটোখাটো নেতারাও। এই পদ্ধতিতে বিক্ষোভও দেখানো হয় অথচ তাঁদের গায়ে আঁচটুকুও লাগে না। বরং গুরুত্ব পাওয়ায় তাঁরা মনে মনে খুশিই হন। এই পদ্ধতিতে যদি সত্যি সত্যি যানবাহন না পুড়িয়ে যানবাহনের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়, তবে কি ভালো হয় না ? সেসব ক্ষেত্রে চিহ্নিত যানবাহনের নম্বরগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। স্টেশনে স্টেশনে নানা কারণে ট্রেন অবরোধ করে রাখা হয়। অবরোধকারীরা ট্রেনের কুশপুত্তলিকা তৈরি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেটিকে আটকে রাখতে পারেন। কাউকে ঘেরাও করার প্রয়োজন হলেও এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তার কুশপুত্তলিকাকে কড়া প্রহরায় রেখে দেওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ। তবুও যদি কর্তৃপক্ষ অনমনীয় থাকেন তবে সেই কুশপুত্তলিকায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে সব জ্বালা মিটিয়ে ফেলা যায়। আগুন আছে, দাহ আছে, হিংস্রতা প্রকাশের ব্যাপক সুযোগও থাকছে। কিন্তু কারও কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। যাঁরা যেকোনো কারণেই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে এই অপকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাঁরা বিষয়টি ভেবে দেখতে পারেন।

নির্মলকুমার ভট্টাচার্য
নিউটাউন, আলিপুরদুয়ার।

শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অনুরোধ

আজকাল সব পড়ুয়ারাই ইংরেজিমাধ্যমে পড়াশোনা করতে চায়। ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের সংখ্যাও কম নয়। তবে সেসব স্কুলে ব্যয়াধিক্য রয়েছে। স্কুলের ছাত্র ভরতি যদি করা হয় একশো, তবে ফর্ম বিক্রি করা হবে এক হাজার। প্রত্যেক ফর্মের মূল্য রাখা আছে পাঁচশো। কাকভোরে লাইনে দাঁড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা। ফর্ম যদিও পেলাম ভরতির সময় আবার ভাগ্য পরীক্ষা। না হলে পাঁচশো টাকাও জলে গেল। ভরতির কি এটাই নিয়ম নাকি অনিয়ম কিছু বুঝি না। স্কুলে ভরতি নিয়ে সাধারণ মানুষ নাজেহাল হয়ে যায়। সরকার সাধারণ মানুষের কথা ভেবে যদি প্রথম ক্লাস থেকেই সরকারি স্কুলে ইংরেজিমাধ্যমে পড়াশোনার ব্যবস্থা চালু করেন তবে অভিভাবকরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

রেবা দাসসাহা
সুকান্তপল্লি, শিলিগুড়ি।

দেখলাম হাসিমুখ

ভারাক্রান্ত মনে প্রিয়জনকে কাছে পেলে মন আবেগ উচ্ছ্বাসে উথলে ওঠে। মা দুর্গা দুর্গতিনাশিনীর বিদায়বেলায় সেই দৃশ্য দেখলাম দুই নেতার আবেগ উচ্ছ্বাসের হাসিতে। এ হাসি আন্তরিক, এ হাসি বন্ধুত্বের। পর্যটনমন্ত্রী ও মেয়র মহোদয়ের হাসি দীর্ঘায়ু হোক।

নৃপেন্দ্রনাথ সরকার
বিনয়কৃষ্ণপল্লি, মাটিগাড়া, দার্জিলিং।

এ বিভাগে ছবি সহ স্থানীয় সমস্যা নিয়ে পত্রলেখকরা চিঠি পাঠান। পাঠাতে হবে জনমত বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, শিলিগুড়ি— এই ঠিকানায়।

পুলিশবাহিনী নিয়ে একটি প্রস্তাব

পুলিশবাহিনীর কাজ হল শান্তিরক্ষা করা। এর জন্য পুলিশবাহিনীকে শান্তিতে বা নিরপেক্ষ থাকতে হবে। আমরা দৈনিক সংবাদপত্রে যা পড়ি, বাস্তবে যা দেখি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। আমরা দেখতে পাই পুলিশি নিরাপত্তায় আছেন কোনো ব্যক্তি অথচ তিনি আইনের খাতায় ফেরার। কোনো ব্যক্তি জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন, জনসভার শান্তিশৃঙ্খলার দায়িত্বে আছে পুলিশ। এমন শত সহস্র ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় পুলিশবাহিনী শান্তিতে বা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। পুলিশকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হলে পুলিশকে নিরপেক্ষ শাসনাধীন থাকতে হবে। পুলিশকে যাঁরা শাসন করবেন, তাঁরা যদি হন নিরপেক্ষ, তবেই পুলিশবাহিনী হবে নিরপেক্ষ। এটা সম্ভব হবে, যদি পুলিশবাহিনী হয় স্বশাসিত। পুলিশবাহিনী একমাত্র তাদের আধিকারিক দ্বারা পরিচালিত হবে। পুলিশবাহিনী থাকবে একমাত্র ভারতীয় সংবিধানের অধীন। তারা মেনে চলবে ভারতীয় আইনকে। তাদের করা হোক স্বশাসিত।

মণীন্দ্রনাথ বর্মন, কংগ্রেসপাড়া, জলপাইগুড়ি।

আত্মহত্যা নিয়ে নতুন আইন লাগু হচ্ছে

আগামী জানুয়ারি মাস থেকে দেশে একটি নতুন আইন বলবৎ হতে চলেছে। মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা আইন, ২০১৭। দেশের অনেক মানুষেরই মানসিক স্বাস্থ্য ভালো নেই। গত ফেব্রুয়ারিতে হু জানিয়েছে, ৫ কোটি ৬০ লক্ষ ভারতীয় অবসাদগ্রস্ত। ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ভারতীয় অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডারে ভুগছে। এছাড়াও রয়েছে অন্য অনেক মানসিক সমস্যা। সম্ভবত এহেন কারণেই ভারতে, বলা হচ্ছে, আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে।

কিন্তু এদেশে আত্মহত্যা অপরাধ বলেই গণ্য। যেখানে হত্যা শব্দটি যুক্ত সেখানে অপরাধতত্ত্ব তো এসে পড়বেই। তাই আত্মহত্যার চেষ্টাও অপরাধ বলে ধরে নেওয়া হয়। নতুন আইন এলে আত্মহত্যা আর অপরাধ থাকবে না। আত্মহত্যার চেষ্টাও ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতা থেকে বাদ পড়বে। সংসদে বিল পাশ হয়ে গেছে। রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দিয়ে দিয়েছেন। ফলে আত্মহত্যাকে অপরাধের তকমাযুক্ত করার ক্ষেত্রে আইন বলবৎ করায় আর বাধা থাকছে না। একটা মানুষ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে বলেই সে আত্মহত্যার পথে গিয়েছে। তাকে সহানুভূতি জানানো যায়, করুণা করলেও করা যেতে পারে। কিন্তু অপরাধী সাব্যস্ত করলে তা বুকে বেদনা হয়েই বাজবে। এ আইনের আরও কিছু দিক রয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার থেকে কোনো বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রে যে কাউকে ইচ্ছে হলেই মানসিক রোগী বলে চিকিৎসার জন্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে না। প্রত্যেক জেলায় থাকছে এক বা একাধিক মেন্টাল হেলথ রিভিউ বোর্ড। কাউকে মেন্টাল হাসপাতালে দিতে গেলে এই বোর্ডের অনুমোদন লাগবে। এটি অত্যন্ত ভালো ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে। কে কাকে কীভাবে বিপদে ফেলতে চায়, বিপন্ন করতে প্রয়াসী হয়, এখন তা বলা মুশকিল। জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নজর থাকলে নাগরিক সমাজ আশ্বস্ত হতে পারবে। জানি, দেশে অপরাধ ক্রমবর্ধমান। তাতে আত্মহত্যাকেও যুক্ত না রাখলে চলবে। তবে তাই বলে, দেদার আত্মহত্যার ঘটনা ঘটতে থাকুক – তেমনটাও কাম্য নয়। আত্মহত্যা কমিয়ে আনতে সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির পূর্ণ উদ্যমে কাজ করা উচিত।

প্রিয় দাশগুপ্ত
শিবমন্দির, দার্জিলিং।

প্যাঁচফোড়ন

ভালোবাসা, ভালোবাসা!

উত্তরায়ণ দেব

'তোমরা যে বল দিবস-রজনী 'ভালোবাসা' 'ভালোবাসা'-/সখী ভালোবাসা কারে কয় !' সে একখান ভালো-বাসা বাগাবার মতলব তো লয় ! প্রকৃত ভালোবাসা দুটো মনকে বাঁধে। দুই মনের কোনো একটিতে যদি বুদ্ধি বাসা বাঁধে সেই ভালোবাসা একসময় পিঠটান দেবে। আর ভালোবাসায় দুই প্রান্তেই যদি বুদ্ধি নেয় দখল, তবে তো 'হরিবোল'(Horrible)!

এক হরিধ্বনি উঠেছে মিডিয়ায়। দল থেকে বিতাড়িত এক নেতা তার প্রেমিকাকে নাকি বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস সেরে এখন বিয়েতে নারাজ। চোর, খুনিরও যুক্তি থাকে। এখানেও উভয়পক্ষেই সাফাই গাওয়া চলছে। চলছে একে অপরের প্রতি আইনি হুংকার, কাদা ছোড়াছুড়ি। দুজনেই মিডিয়ায় ডিম পাড়ছে, অমলেট খাচ্ছি আমরা। প্রেমের এই চাটনিতে প্রেমটাই লাপাতা, সেটাই দেখছে না কেউ। ভালোবাসার লেভেল সাঁটিয়ে তার আড়ালে দুই পক্ষেই হয়েছে লেনদেন। চূড়ান্ত স্বার্থের সম্পর্কে বেচারা 'ভালোবাসা' শব্দটিকে টেনে এনে কলঙ্কিত করা হচ্ছে। 'ভালোবাসা' শব্দটা কারোরই অভিধানে নেই।

'ভালোবাসা' কারে কয় ? এই ব্যাপারে স্বর্গের মিডিয়ায় একটি খবর প্রচারে এসেছিল। একজন প্রতিবেদক কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করে যে, আপনার প্রত্যেক সখীই আপনাকে ভালোবাসে, তা সত্ত্বেও আপনি সারাক্ষণ রাধা, রাধা কেন করেন ? কেন তাকে বেশি ভালোবাসেন ? কৃষ্ণ বলেন, আপনি গিয়ে সব সখীকে বলুন যে আমি অসুস্থ। একমাত্র কোনো সখীর পা ধোয়া জল পান করলেই আমি সুস্থ হব। সেই প্রতিবেদক জলের অন্বেষণে বেরোয়, কিন্তু প্রত্যেক সখীই তাকে ফিরিয়ে দেয় এই বলে যে, প্রভুকে নিজের পা ধোয়া জল দিলে তাদের পাপ হবে, নরকবাস হবে। শুধুমাত্র রাধা রাজি হয়। রাধা বলে যে, আমার পা ধোয়া জল পান করে প্রভু যদি সুস্থ হয়, তাহলে প্রভুর সুস্থতার জন্য আমি এই পাপ কাজ করে আজীবন নরকবাসেও রাজি আছি। জানা গেছে 'ভালোবাসা'র এই উদাহরণ দেখে এই প্রতিবেদক আজও স্বর্গের আইসিইউ-তে। আজকের বাজারে 'ভালোবাসা'র এই নমুনায় আমাদেরও পাগলা চেপে যাওয়ায়ই বেস্ট। নিজের অন্তরের ভালোবাসাকে সম্মান দিতে গুমরে শেষ হয়ে যাব, তবুও তাকে বাজারি করব না, এটুকু আশা করাই যায়। এক্ষেত্রে 'ভালোবাসা' যে কারোরই ছিল না, বোঝাই যাচ্ছে। পাবলিকলি দুজনেই অপরকে নাঙ্গা করছে, এ কেমন ভালোবাসা !

কোনো শিক্ষিত রাজনৈতিক কর্মীর রাজনৈতিক আদর্শ থাকবে আশা করাটাই বাহুল্য। কিন্তু সেই রাজনৈতিক আদর্শের আধার মানুষটাই যদি মানবিক গুণসম্পন্ন না হয়, তবে কীসের আদর্শ, কীসের নানা 'ইজম'-এর কচকচানি ? এর চেয়ে তো অশিক্ষিত ন্যাপলাও ভালো, যে অন্তত আদর্শের মুখোশ পরে না। 'ইজম' প্যাদানো পার্টিবাজি এক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার ও ধান্দাবাজির নামান্তর। হাতেগোনা কয়েকজনকে বাদ দিয়ে, ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণেই ৩৪ বছরের রং আজ ধুয়ে মুছে সাফ।

দেশে-বিদেশে মিলিয়ে মোট ১৯ বার শারীরিক মিলনের অভিযোগ করা হচ্ছে। শারীরিক মিলনের মতো মানসিক এক অপার অনুভূতি প্রথমবার কিংবা সংখ্যায় দু-একবার মনে রাখা, মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু পার্টিকুলার ১৯ বার ? সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে সম্পর্কটায় প্রথম থেকেই মনের জায়গায় বুদ্ধি দখল নিয়েছিল। ভালোবাসার মলাটে এই লেনদেনমূলক সম্পর্কে 'লেন' এবং 'দেন' দু-পাশেই যথেষ্ট ব্যালান্সড। কেউই একা বেশি দেয়নি বা নেয়নি। নানান সুবিধা ছাড়াও যে পরিমাণ টাকা হাতে, অ্যাকাউন্টে, প্রতিশ্রুতিতে দেওয়া হয়েছে বলা হচ্ছে, আজকের বাজারে তার পরিমাণটাও কম নয়।

নৌকা আবার কোন বড়োঘাটে ভিড়বে সেই আশায় অন্য এক আরোহিণী নৌকায় সওয়ার হয়ে মাঝির সপক্ষে গলাবাজি শুরু করেছে। আগামীতে আবারও এমন খবর মিডিয়ায় আসবে। শুধু বদলে যাবে নৌকা, মাঝি আর সওয়ারির নাম। আমরা তর্কে মাতব, হ্যাঁ আবারও।